তাজ নিয়ে সুপ্রিমকোর্টের তোপ সময়োচিত

উত্তরপ্রদেশের আগ্রায় তাজমহল সারা বিশ্বের অন্যতম আশ্চর্য। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সারা বছর পর্যটকরা আসেন তাজমহল দেখতে। অথচ তাজমহলের কোনও সংরক্ষণের প্রকৃত ব্যবস্থা নেই। এমন ঐতিহাসিক নির্দশন, অপরূপ কারুকার্য, স্থাপত্য ধীর ধীরে নষ্ট হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ সরকার কিংবা আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া কার্যত তাজমহল সংরক্ষণে নির্বিকার। ফলে তাজমহল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দুষণে। তাজমহলের চারিদিকে গাজিয়ে উঠেছে অসংখ্য হোটেল, রেস্তোঁরা, এদের গ্যাসচুল্লির কালো ধোঁয়ায় বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে তাজমহলের সব পাথর। পাশাপাশি সংরক্ষণের অভাবে শিথিল হয়ে যাচ্ছে এর কারুকার্য। সম্প্রতি প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে দু'বার ধসে পড়ে তাজমহলের মিনার। এরপরও এক শ্রেণির পর্যটকের উৎপাত, যত্রতত্র খাবারের প্যাকেট ফেলা পাথরের গায়ে পানের পিক ফেলা। সব মিলিয়ে ঐতিহাসিক তাজমহল মুখ থুবড়ে পড়ার উপক্রম। কিন্তু কোন হেলদোল নেই রাজ্য সরকারের। এর ফলে তাজমহলের ক্ষতিতো হচ্ছেই। একই সঙ্গে দেশের বিরাট আর্থিক ক্ষতিও হচ্ছে, এই প্রেক্ষিতে সুপ্রিমকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন পরিবেশ বিদ এম.সি. মেহতা তাজমহলের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে। এই মামলায় শীর্ষ আদালতের তোপ কেন্দ্রকে। এর প্রয়োজন ছিল। এখন সুপ্রিম কোর্টের এই কঠোর মন্তব্যের পর উত্তরপ্রদেশ সরকার নড়েচড়ে বসবে বলেই আশা। এই প্রেক্ষিতে সমন্বয়ে দাবি উঠুক, তাজমহলের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—নরেন্দ্র এসেছে?

মাষ্টার—আজ্ঞে হাঁ।

অভিনয় হইতেছে। কর্ণ ও পদ্মাবতী করাত দুই দিকে দুইজন ধরিয়া বৃষকেতুকে বলিদান করিলেন। পদ্মাবতী কাঁদিতে কাঁদিতে মাংস রন্ধন করিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অতিথি আনন্দ করিতে করিতে কর্ণকে বলিতেছেন, এই বার এস, আমরা একসঙ্গে বসে রান্না মাংস খাই। অভিনয়ে কর্ণ বলিতেছেন, তা আমি পারব না; পুত্রের মাংস খেতে পারব না। একজন পুত্র সহানুভূতি-ব্যাঞ্জক অস্ফুট আর্তনাদ করিলেন। ঠাকুরও সেই সঙ্গে দুঃখপ্রকাশ করিলেন।

অভিনয় সমাপ্ত হইলে ঠাকুর রঙ্গমঞ্চের বিশ্রাম ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গিরিশ নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা বসিয়া আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে প্রবেশ করিয়া নরেন্দ্রের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন ও বলিলেন, আমি এসেছি।

[Concert বা সানাইয়ের শব্দে ভাবাবিষ্ট]

ঠাকুর উপবেশন করিয়াছেন। এখনও ঐকতান বাদ্যের (কনসার্ট) শব্দ শুনা যাইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—এই বাজনা শুনে আমার আনন্দ হচ্ছে। সেখানে (দক্ষিণেশ্বরে) সানাই বাজত, আমি ভাবাবিষ্ট হ'য়ে যেতাম; একজন সাধু আমার অবস্থা দেখে বলত, এ সব ব্রহ্মজ্ঞানের লক্ষণ।

[গিরিশ ও 'আমি আমার']

কনসার্ট থামিয়া গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—এ কি তোমার থিয়েটার, না তোমাদের?

গিরিশ—আজ্ঞে আমাদের।

শ্রীরামকৃষ্ণ-**আমাদের** কথাটিই ভাল; **আমার** বলা ভালো নয়!

দিনপঞ্জিকা

২৮ আষাঢ়, ভাং ২২ আষাঢ়, **১৩ জুলাই**, ২৮ আহার, সংবৎ ১৫ আষাঢ় বদি, ২৮ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২৩। **শুক্রবার**, অমাবস্যা দিবা ঘ ৯।০ মিঃ। পুনর্ব্বসুনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৯।৪ মিঃ। ব্যাঘাতযোগ দিবা ঘ ১০।৩৯ মিঃ। নাগকরণ, দিবা ঘ ৯।০ গতে কিন্তুঘ্নকরণ, রাত্রি ঘ ৭।৪৬ গতে ববকরণ। **জন্মে**—মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ঘ ৩।২৮ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাত্রি ঘ ৯।৪ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। **মৃতে**—দ্বিপাদদোষ রাত্রি ঘ ৯।৪ গতে দোষ নাই। **যোগিনী**—ঈশানে, দিবা ঘ ৯।০ গতে পূর্ব্বে। **বারবেলাদি** ঘ ৮।২৩ গতে ১১।৪৩ মধ্যে। **কালরাত্রি**—ঘ ৯।৩ গতে ১০।২৩ মধ্যে। **যাত্রা**—নাই, দিবা ঘ ২।১৫ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ঘ ২।৫৬ গতে পূর্ব্বে উত্তরে নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**—দিবা ঘ ২।১৫ গতে পুরত্রধারণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য ধান্যস্থাপন ভূমি ক্রয়বিক্রয় কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। **বিবিধ**—প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। **অমাবস্যার ব্রতোপবাস। শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের নেত্রোৎসব ও উড়য়যাত্রা (উৎকল)।** রাত্রিতে **শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের গুণ্ডিচামার্জ্জন** (উৎকল)। দিবা ঘ ৯।০ মধ্যে হুগলী জেলার ভালিয়ায় ডাকাতকালী মাতার বাৎসরিক পূজা ও মেলা। দিবা ঘ ৯।০ গতে মুখ্যোচ্চাস্ত আষাঢ় শুক্লপক্ষ হিন্দি আষাঢ় সুদি আরম্ভ। **আংশির গ্রাস সূর্য্যগ্রহণ** (ভারতবর্ষে অদৃশ্য)। **গোর্খকবি ভানুভক্ত আচার্য্যের জন্মদিবস** (১৩ জুলাই, ১৮১৪ খ্রীঃ)। **মাহেন্দ্রযোগ**—দিবা ৫।৫৬ গতে ৬।৪৯ মধ্যে ও ৯।২৯ গতে ১০।২২ মধ্যে। **অমৃতযোগ**—দিবা ঘ ১২।৯ গ তে ২।৪৯ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৮।৩০ মধ্যে ও ১২।৪৬ গতে ২।৫৫ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৫।৪ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২৮ আষাঢ়, ভাং ২২ আষাঢ়, ১৩ জুলাই, ২৮ শওয়াল, ২৮ আহার, উঃ ৫।০২, অঃ ৬।২১, শুক্রবার, অমাবস্যা দি ঘ ৮।৫৯, সেহরী শেষ ৩।২৮ ইফ্‌তার শেষ ৬।২৯।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

আমার ধর্ম আমাকে মানবিক হতে বাধা দেয় না

সেখ হাসান ইমাম
শেষ পর্ব

কিন্তু 'বিরুদ্ধবাদীরা' এই আয়াতটি চেপে যায়। কোরআন শরীফে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে-- নরহত্যা এবং দুনিয়াতে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার অপরাধ ব্যতীত যে ব্যক্তি অন্য কোনও ব্যক্তিকে হত্যা করল, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল। আর যে তাকে বাঁচাল, সে যেন সব মানুষকেই বাঁচাল (সূরা- মায়েদাহ-আয়াত-৩২)। রসুলুল্লাহ বলেছেন, ''মনে রেখো, যদি কোনও মুসলমান কোনও অমুসলিম নাগরিকের ও পর নিপীড়ন চালায়, তার অধিকার খর্ব করে, তার কোনও বস্তু জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহর আদালতে তার বিরুদ্ধে অমুসলিম নাগরিকের পক্ষ অবলম্বন করব।'' (আবু দাউদ শরীফ-৩০৫২)। 'ধর্মের ব্যাপারে কোনও জবরদস্তি নেই''-- (সূরা-বাকরাহ, আয়াত-২৫৬)। সুরা আন আমের ১০৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, ''আর আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। কেননা, তারা পরিণামে সীমা লঙ্ঘন করে আল্লাহকে গালি দিবে।'' হজরত ইবনে উমরের বর্ণনায় আছে প্রিয় নবী (সাঃ)—এর কাছে এক ব্যক্তি জানতে চাইলো, ''হে আল্লাহর নবী, আল্লাহর কাছে কোন মানুষটি সবচেয়ে বেশি প্রিয়?'' নবীজি (সাঃ) বললেন, ''ওই মানুষ তাঁর কাছে বেশি প্রিয় যার মাধ্যমে মানুষ বেশি উপকৃত হয়।'' এখানে বলার দরকার হয় না যে, নবী মানুষ বলতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের প্রতি মানবিক হলেই আমি প্রকৃত মুসলমান হতে পারব। প্রসঙ্গত বলি—অনেক অমুসলিম অভিযোগ করেন যে, মুসলিমরা 'জিহাদ' বা 'ধর্মযুদ্ধের' নামে সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দেয়। এ বক্তব্য সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ইসলামে সন্ত্রাসবাদের কোনও স্থান নেই। আর 'জিহাদ' শব্দের অর্থ প্রচেষ্টা, সাধনা, সংগ্রাম। 'জিহাদ' মানে ধর্মযুদ্ধ নয়। খ্রিষ্টানরা 'ক্রুসেড' অর্থে 'ধর্মযুদ্ধ' ব্যবহার করেছিল। ইসলামি পরিভাষায় 'জিহাদ' হল ব্যক্তির সর্বপ্রকার সামর্থ্যকে আল্লার পথে প্রয়োগ করা। ধর্ম বিপন্ন হলে তাকে টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা হল

'জিহাদ'। ধর্মের নামে নিরীহ মানুষকে হত্যা করা 'জিহাদ' নয়। আর মূলত এই সংগ্রাম নিজের কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে। বাবা মায়ের সেবা করাও 'জিহাদ' এর অন্তর্ভুক্ত।

এখানেই আলোচনা শেষ করা যেত। কিন্তু আর একটি দিকে কিছু আলোকপাত না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন, ''আল্লাহর রসুলের মধ্যে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ আছে (সূরা-আহযাব, আয়াত-২১)। যিনি আমাদের আদর্শ, বাস্তবে তিনি কি আচরণ করেছেন, সত্যের প্রচারে প্রবল বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হয়েও মানবতার কোন আদর্শ তিনি তুলে ধরেছেন, সংক্ষেপে হলেও সে আলোচনা একান্তই প্রাসঙ্গিক। ৬২২ খ্রীঃ বিশ্বনবী মক্কা থেকে মদিনায় হজরত করেন। এই সময় মদিনায় মুসলমান ছাড়া ইহুদি, খ্রিষ্টান, পৌত্তলিক প্রভৃতি জাতির বাস ছিল। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী মহানবী (সাঃ) সব জাতির নেতাদের নিয়ে 'মদিনা সনদ' নামে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদনা করেন। তিনি এই সনদের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতি ধর্ম ও বর্ণের সমন্বয়ে এক আদর্শ সমাজ গঠনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এর ফলে চারিদিকের চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে মদিনাতে একটি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ তৈরি হল। এককথায় বলা যায় মহানবীর এই মহৎ প্রয়াস প্রায় দেড় হাজার বছর আগে আমাদের মানবাধিকার সম্পর্কিত ধারণার একটি উজ্জ্বল রূপরেখা উপহার দিয়েছে। এছাড়া তার জীবন থেকে এমন অসংখ্য উদাহরণ তুলে ধরা যায়, যেখানে তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। তায়েফবাসীরা তাঁকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করেছে। তিনি নিজে ক্ষমা করেছেন এবং আল্লাহ যাতে তাদের ক্ষমা করেন সে জন্য দোওয়াও করেছেন। যে ইহুদিনী তাঁর যাতায়াতের পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত, সে অসুস্থ হলে পরম মমতায় তাঁকে দেখতে গিয়েছেন এবং শুশ্রূষা করেছেন। যে অমুসলিম বৃদ্ধা তাঁর সম্পর্কে নানা কটূক্তি করেছে, তার কাছে নিজের পরিচয় গোপন রেখে তিনি তার মোট নিজের মাথায় নিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিয়েছেন। একবার একজন বিধর্মী বেদুইন হজরতের উপস্থিতিতে মসজিদের ভিতর প্রস্রাব করতে লাগল। সাহাবীরা চিৎকার করতে থাকে মারতে উদ্যত হলেন। মহানবী বললেন, ওকে প্রস্রাব করতে দাও, তারপর এখানে পানি ঢেলে দাও এবং যেতে দাও। যারা তাঁকে তাঁর প্রিয় জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত করেছে এবং যারা তাঁকে বারবার হত্যা করার জন্য চেষ্টা করেছে, তিনি তাদের শুধু ক্ষমাই করেননি জীবনের নিরাপত্তাও বহন করেছেন। কোরআনে হাদিস এবং বিশ্বনবীর জীবনাদর্শ একজন মুসলিমকে আদ্যন্ত মানবিক হতে শিক্ষা দেয়। পরিশেষে বলি, আমার ধর্ম আমাকে দেশপ্রেমের পাঠ দেয়। প্রিয় নবী বলেছেন, ''দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ''। তাই নির্দ্বিধায় বলতে পারি, আমি মুসলিম। আমার ধর্মইসলাম। ভারত আমার জন্মভূমি, ভারতবাসী আমার আত্মীয়। ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। আর একজন মুসলিম মানব প্রেমিক হিসাবে বলতে পারি সারা বিশ্বই আমার স্বদেশ, সমগ্র মানব মন্ডলী একজাতি।

জীবনানন্দের কবিতায় যৌন আবহ

পার্থসারথী হাটি
পর্ব ২

দখিনা বাতাস, চাঁদের আলো, ঘাই হরিণীর ডাক, মেয়েমানুষের নোনাগন্ধ এসবই প্রকাশান্তে এক পরিপূর্ণ মিলনের পাঠভূমি। ঘাই হরিণীর ডাক ও হরিণীর অনুগামিতা ও চিরন্তন জৈব প্রক্রিয়াই নারী ও পুরুষের মিলনার্তি। জীবনচক্রে খাবার সংগ্রহ ও বেঁচে থাকার লড়াই পর্বে দাঁড়িয়ে মিলন ব্যাকুলতার অভিমুখে। বিপরীত দুই লিঙ্গের সৃষ্টিকামী অভিসার। জৈব অস্তিত্বের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠায় 'মানুষ যেমন করে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে' তেমনি করেই। হরিণেরা আসিতেছে ঘাইহরিণীর দেহগত প্রবৃত্তির বৃত্তে। ঘর্মাক্ত শরিরীনীর গায়ের ঘ্রাণে জীবনানন্দ লাগিয়ে দিলেন স্পর্শকাতরতার মদির আপ্যায়ন, জৈব আসক্তির পূরণ-ক্রিয়ার সামর্থ্য ও সবলতা। মেয়ে মানুষের নোনা ঘ্রাণে গন্ধ নয়, স্পর্শ স্বাদই মুখ্য হয়ে ওঠে। এই লবনাক্ত স্বাদের পরিপূর্তি দেয় না। কিন্তু অপূর্ণতা ও অতৃপ্তির আকর্ষণেই শরীরে এক গভীর স্বাদ জেগে ওঠে। 'নোনা' শব্দটি যেন এই গভীরতার প্রেক্ষিতেই রক্ত মাংসের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। সৃষ্টি ক্রিয়ার রমন মাধুর্যে বুনো জীব ও জঙ্গলের প্রতীকে আদিম যৌন জীবনের উদ্ভাসন। 'বন' ও 'জোৎস্না'-য় আদিমতা ও মাধুর্য। 'বিশ্বয়' ও 'শরীরের স্বাদ' এই উপলব্ধি ও উপভোগ্যতা। এই মিলনোন্মত্ততায় 'কেবল পিপাসা আছে,/রোমহর্ষ আছে'। আর এ শুধু বন্যদের জীবনচক্র নয়, মানুষের জৈব প্রবৃত্তি পরিপূরণেও মিলন ও পিপাসার একই রূপ। কিন্তু কবি উপলব্ধি করলেন শিকারী সভ্যতার কুটিল প্রবঞ্চনার কাছে আদিম জৈব-লালসার পরিতৃপ্তিতে স্বতঃস্ফূর্ত রমন 'নিঃসহায়তার সুর'

যেন আবহমান কালের স্থায়ীরূপ-
তাদের মতন নই আমিও কি ?
কোন এক বসন্তের রাতে
জীবনের কোন এক বসন্তের রাতে
আমাকেও ডাকেনি কি কেউ
সে জ্যোৎস্নায়-দখিনা বাতাসে
ওই ঘাইহরিণীর মতো ?

এই নিঃসহায়তার প্রত্যক্ষ দর্শকও শ্রোতা, অনুভাবী কবিকে তাই প্রেমিক হননের নির্মমতা ভুলে যেতে হয়। কেননা, ব্যাথা ও প্রেমের মধ্যেই আমাদের নিষ্ঠুর সচলতা। এই প্রতারক সভ্যতার শরিক ও শিকার আমরা সবাই।

'পাখিরা' কবিতাকেও বসন্তরাতের পটভূমিতে কবি বিছানায় নিদ্রাহীন। কেননা, 'শরীরে এসেছে স্বাদ বসন্তের রাতে।' মেরুপাহাড়ের কোল থেকে পাখিরা উড়ে আসে শরীরী স্বাদের গুঞ্জরণ নিয়ে। জন্ম-মৃত্যু-চৈথুনের অনিবার্যতা মানুষের যেমন, পাখির জীবনচক্রেও একই রকম। মৃত্যুকে পরাভূত করে লক্ষ লক্ষ মাইল সমুদ্র অতিক্রমী পাখিরা নেমে আসে ক্ষেতে। প্রিয়ের শরীরী ক্ষেত কর্ষণের উদ্যামতায় জৈবিক সত্যের চরম ও পরম প্রকাশ। এদিকে নিরাপদ জীবনের আশ্বাস লাভে মাটির অন্বেষণ, অন্যদিকে বংশবিস্তারের জৈব-প্রবৃত্তি বৃত্তে 'তাঁদের প্রথম ডিম জন্মিবার এসেছে সময়'। ভালোবাসা-ভালোবাসার সন্তান-ভালোবাসার গভীর স্বাদ-- এই প্রক্রিয়ায় প্রাণীমাত্রেরই যৌন জীবনের বা অনিবার্য রমন ক্রিয়ার চিরন্তন প্রার্থিত পরিণতি পর্বটি লক্ষ করি।

সুমিতা চক্রবর্তীর কথায় 'আকাশে ওড়া পাখি কোনো মুক্তির দৌত্য করছে না। জন্ম, মৃত্যু প্রাণরক্ষার তাগিদ ও বংশ বিস্তারের বাসনা তথা যৌন আকাঙ্খায় প্রতিটি প্রাণীর জীবন চক্র সম্পূর্ণ করে সে। বিপুল, অদম্য প্রাণাকাঙ্খা-যার মধ্যে আত্মরক্ষা ও যৌনপ্রবৃত্তি দুইই আছে-এই প্রাণ বাসনা ছাড়া প্রকৃতির ও প্রাণীজগতের অস্তিত্বের ভিন্নতার কোনও অর্থ নাই।' *(জীবনানন্দ, সম্পাদনায় পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়/ 'বিজ্ঞানচেতনা ও জীবনানন্দের কবিতা'-সুমিত চক্রবর্তী)*

ইন্দ্রিয় উপভোগ্যতাকে ইন্দ্রিয়াতীত উপলব্ধির শিল্পসফল পরিবেষণায় জীবনানন্দই সম্ভবত প্রথম। ১৩৩৩ (ধূসর পাণ্ডুলিপি) কবিতাতে প্রেমিকার আকস্মিক মৃত্যুজনিত বিচ্ছেদ বেদনায় কবির আর্তিতে জেগে রয়েছে রক্ত-মাংস-ভালোবাসার প্রগাঢ়তা--

তোমার শরীর জানি মিটায় পিপাসা
কে সে আজ! তোমার রক্তের ভালবাসা
দিয়েছে কাহারে।

'পিপাসার গান' (ধূসর পাণ্ডুলিপি) কবিতাতেও প্রকৃতি—রমনের মধ্য দিয়ে মানবজীবনের যৌনতার আবহটি বেশ চড়া সুরেই বাঁধা। কবিতাটি থেকে প্রকৃতি যেমন স্পর্শ-গন্ধ নিরপেক্ষতায় বা সাপেক্ষতায় স্বাদু হয়ে ওঠে, তেমনি মানবীও তার দেহগত স্পর্শ-গন্ধ সাপেক্ষতায় পুরুষের দেহ-সুখ ভোগের সাধকে জাগিয়ে তোলে। জৈব প্রবৃত্তির অনিবার্যতায়। 'সেই জলমেয়েদের স্তন' জলীয় উদাসীনতা তৈরি করলেও ঠাণ্ডা সাদা বরফের কুচির মতন—একথার মধ্য দিয়ে আসক্তির তীব্রতায় ঘনত্ব এসে যায়। স্পর্শ-বর্ণ ও দৃশ্যেন্দ্রিয়গুলিকে একই সঙ্গে অনুভবে টানটান করে তোলে। ফলে পাঠককে প্রাকৃতিক বিশুদ্ধতায় আর বেঁধে রাখা সম্ভব হয় না। 'দেহের স্বাদ' কখনো প্রকৃতির সঙ্গে নিরবিচ্ছিন্নভাবে আবার কখনো বিচ্ছিন্নভাবে প্রগাঢ় উদ্দীপনায় কথা কইতে চায় –

ক. 'মোর দেহ ছেনে গেছে অলস–আদুল
কুমারী আঙুল
কুয়াশার; ঘ্রাণ আর পরশের সাধ
জাগায়েছে; (পিপাসার গান / ধূসর পাণ্ডুলিপি)
খ. 'হেমন্তের রৌদ্রের মতন
ফসলের স্তন
আঙুলের নিভাড়ি
এক ক্ষেত ছাড়ি
অন্যক্ষেতে চলিব কি ভেসে
এ সবুজ দেশে
আর একবার।' (পিপাসার গান / ধূসর পাণ্ডুলিপি)
গ. 'বাংলার নীল সন্ধ্যা–কেশবতী কন্যা যেন এসেছে আকাশে
আমার চোখের'পরে আমার সুখের'পরে চুল তার ভাসে;

(আকাশে সাতটি তারা রূপসী বাংলা)

প্রকৃতির মিহি আবরণটুকু রেখে দিলেও কবিতাংশগুলিতে ইন্দ্রিয়ঘন নিবিড় যৌন আশ্লেষের বাস্তবটুকু গোপন থাকে না। প্রকৃতির আবরণটুকু আসলে যৌনতার গভীর ও গোপন রহুকে কিছুটা ফিকে করে দিয়েছে। তবুও অনায়াসে 'দেহের স্বাদের কথা' যতটুকু শোনা যায় তাতে পঞ্চেন্দ্রিয়ের উন্মাদনা আছে, আছে 'স্তন' ও 'ক্ষেত'-এর উল্লেখ এক সুতীব্র যৌন আসক্তির ইন্দ্রিয়ঘন ছবি। চোখে মুখে নারীর চুলের বিস্তারেও যৌবনতারই ইঙ্গিত। আবার করবী বৃন্তচ্যুত করলে ছিন্নস্তনের দুধ কবি হৃদয়ে নরম ব্যাকুলতা নিয়ে যন্ত্রণায় ছড়িয়ে পড়ে। যৌন আসক্তির ক্ষেত থেকে প্রেমের ক্ষেত্রে এভাবেই পৌঁছে যান জীবনানন্দ। একথা বিশ্বাস করাই সমাচীন যে--যৌন আসক্তির হাত ধরেই প্রেমের ক্ষেত্রে পৌঁছনো সম্ভব, বাস্তবের সিঁড়ি বেয়ে যেমন পৌঁছনো সম্ভব অতিবাস্তব জগতে।' (মহাগোধূলির কবি বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়)।

বনলতা সেন বিবাগী প্রেমিককে বাসায় ফেরার ব্যাকুল কামনা নিয়ে দৃষ্টিপত্র ছুঁড়ে দিয়েছে। এতদিন কোথায় ছিলেন? সম্ভ্রমবোধে পরিশুদ্ধ এই বাক্যে শুধু জিজ্ঞাসা নয়, দীর্ঘ প্রতীক্ষান্তে বনলতায় বিস্ময়কর প্রাপ্তিও সঞ্চারিত। অনাবিল জৈবিক কামনার পরিপূরণে পাখির নীড়ের মত অগোছালো ঘর সৌন্দর্যময় হয়ে ওঠে। চোখে তোষ্ট প্রত্যাশা। কামনায় ভালোবাসা আর ভালোবাসার সন্তান।

ক্রমশ

সম্পাদক সমীপেষু

সুরের পরশমণি রবীন চট্টোপাধ্যায়

সুরের পরশমণি হিসাবে যিনি নিজের পরিচয় রেখে গেছেন, বাংলা গানে যিনি সুরের মায়াজাল করতে পেরেছিলেন, তিনি আমাদের কাছে রবীন চট্টোপাধ্যায় হিসাবেই রয়েছেন। আজও সুর আছে, তাল আছে,আছে গানের লহড়া। সেই গানের এক দিকপাল সুরকারের নাম রবীন চট্টোপাধ্যায়। শতবর্ষ পার হয়ে যাবার পর আমরা কি মনে রাখতে পেরেছি এই সুরকারকে। অথচ বাংলা গানে তার সুর দেওয়া গানগুলো আজও সমানভাবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে রয়েছে। যারমধ্যে রয়েছে আল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া 'মাটির ঘরে আজ নেমেছে চাঁদ রে' বিদ্যাসাগর ছবির গান। এই ছবির সুরকার ছিলেন রবীনবাবু। ১৯৫০ সালে ছবিটা মুক্তি পেয়েছিল। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সমাপিকা ছবিতে শুনেছিলাম 'দেবতা চেয়েছি প্রতিমা গড়িয়া/গড়িয়াছি তার দেবালয়' ১৯৪৮ সালের গান। সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে, 'চলার পথে থেমে যাও বৃন্দাবন পথযাত্রী'। রবীন মজুমদারের কণ্ঠে, 'আমার আধার ঘরের প্রদীপ যদি নাই বা জ্বলে।' সাগরিকা ছবিতে 'আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে /সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে।' হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'চন্দ্রনাথ' ছবিতে ওই যে রাজার দুলালী সীতা তালাত মেহমুদের কণ্ঠে 'চাঁদের এতো আলো। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'এ শুধু গানের দিন'—এই গানটি পথের ছবি দেরি ছবিতে ব্যবহার করেছিলেন বাংলার মহানায়ক উত্তম কুমার। উত্তম কুমারের অভিনীত বহু ছবিতে রবীনবাবু সঙ্গীত পরিচালনা করে গেছেন। যার মধ্যে রয়েছে(১) অগ্নিপূর্ণার মন্দির, (২) সবার উপরে, (৩) সাগরিকা, (৪) শিল্পী, (৫) চন্দ্রনাথ, (৬) পথে হল দেরি, (৭) বিপাশা, (৮) গৃহদাহ, (৯) যাত্রা হল শুরু, (১০) অভয়ের বিয়ে, (১১) উত্তরায়ন, (১২) মোমের আলো, (১৩) উত্তর মেঘ, (১৪) শুনবরনারী, (১৫) শুধু একটি রাত, (১৬) অপরিচিত, (১৭) কলঙ্কিত নায়ক, (১৮) চাঁদের কাছাকাছি, (২০) সহযাত্রী, (২১) নষ্টনীড়, (২২) সাহেব বিবি গোলাম, (২৩) হারজিৎ। বাংলা যখন বার বার মনে করায় বাংলার সংস্কৃতি কেন সমগ্রভারতবর্ষের চেয়ে আলাদা, তখন সেই বাংলা গানের সাথে যে মানুষটাকে সবার আগে মনে রাখা অবশ্যই প্রয়োজন থাকে। সেই মানুষই হলেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। কারণ তিনিই তো সুরে সুরে বলে গেছেন ''এ শুধু গানের দিন, এ লগনও গান শোনাবার।'

প্রবীর মিত্র
হাওড়া

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উয়ন & সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে,বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২
Email-lipiarambagh@gmail.com

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়